
জয়
জওয়ান

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার নির্দেশ অনুসারে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর দ্রুত পঠন অনুসারে লিখিত।

জয় জওয়ান

[তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য]

শ্যামল কুমার চক্রবর্তী

জ্ঞান তীর্থ :: প্রকাশক
১নং বিধান সরণী, কলিকাতা ১২

॥ প্রথম সংস্করণ ॥

দাম : একটাকা

শ্রীকানাই লাল দাস কর্তৃক 'জ্ঞানতীর্থ' ১, বিধান সরণী, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীকালীশঙ্কর মিত্র কর্তৃক 'নিউ মিত্র প্রেস' ১২।২।এ, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

॥ কেন এই যুদ্ধ ॥

ভারত ও পাকিস্তান এশিয়ার দু'টি দেশ। এক সময় এই দু'টি দেশ একটি দেশই ছিল। কয়েক বছর আগেও ইংরাজের অধীনে আমরা বাস করতাম। আমরা স্বাধীন হলাম ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। কিন্তু চতুর ইংরাজ যাবার সময় ভারত উপমহাদেশকে ভারত ও পাকিস্তান এই দু'টুক্রোয় ভাগ করে দিয়ে গেল। পাকিস্তান সৃষ্টির দাবী যাঁরা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মুসলমান ধর্মের অন্ধ অনুরাগী। তাই পাকিস্তানকে তাঁরা শুধু মুসলমানদের দেশ হিসাবেই গড়ে তুলতে চান। সে দেশে অন্য ধর্মের লোকদের মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সমান অধিকার দিতে তাঁরা নারাজ। কিন্তু অন্যদিকে আমাদের দেশ ভারত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে সব লোকের, সব ধর্মের সমান অধিকার। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন—যিনি যে ধর্মের লোকই হোন না কেন, ভারত রাষ্ট্রের কাছে সকলেই সমান সুযোগ সুবিধা, সমান অধিকার পেয়ে থাকেন।

জন্ম লগ্ন থেকেই পাকিস্তানের নেতারা ভারতকে হিংসা করে আসছেন। কিন্তু কেন এই হিংসা ?—তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক হতে পারে আমাদের

দেশের উন্নতি তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু ভারত কখনও পাকিস্তানের প্রতি কোন অবিচার করেনি। বরঞ্চ ভারত পাকিস্তানের জন্য অনেক সময় অনেক স্বার্থত্যাগ করেছে। আমাদের পরমপ্রিয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য নেতারা চিরদিন পাকিস্তানের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। পাকিস্তানে যখনই কোন বন্যা, সাইক্লোন প্রভৃতি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, তখনই ভারত সরকার ও এই দেশের সাধারণ মানুষ অকাতরে সাহায্য পাঠিয়েছে।

কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের অল্প কয়েকমাসের মধ্যেই পাকিস্তান আমাদের দেশেরই একটা অংশ কাশ্মীরকে গায়ের জোরে দখল করার চেষ্টা করল। আমাদের জওয়ানরা পাকিস্তানের সে চেষ্টাকে অল্পদিনের মধ্যেই ব্যর্থ করে দিল। পাকিস্তান সেবার পালিয়ে বাঁচে।

যুদ্ধে পাকিস্তান হেরে গেল, কিন্তু শান্ত হল না। আবার ভারত আক্রমণের জন্য তারা ফিকির খুঁজতে লাগল। ভারত পাকিস্তানকে সংযত করার জন্য বছরের পর বছর ভাল কথায় বুঝিয়ে আসছে কিন্তু পাকিস্তানের নেতারা কোন ভাল কথা শোনার পাত্র নন।

আবার ১৯৬৫ সালের ৫ই আগস্ট কাশ্মীরে হানাদার পাঠিয়ে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করল। আর সহ্য করা

যায় না তাই ভারতও অগত্যা ১লা সেপ্টেম্বর করল পাল্টা আক্রমণ। এই যুদ্ধ চলেছে একটানা বাইশ দিন। ২৩শে সেপ্টেম্বর দু'পক্ষের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হয়।

ভারত যুদ্ধ চায়নি, চায়ও না। তার উপর এ যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারত বারবার বলেছে আমাদের এই যুদ্ধ পাকিস্তানের কোন জমি দখল করার জন্য নয়। আমরা অস্ত্র ধরেছি শত্রুপক্ষের শক্তিক্ষয়ের জন্য। আমাদের শত্রু পাকিস্তানের দশ কোটি অধিবাসী নন, শত্রু হল যে সব জঙ্গী নেতা এই যুদ্ধকে ডেকে এনেছে।

আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বাইশ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধবাজ নেতারা তাদের বেয়াদবির সমুচিত জবাব পেয়েছে। পাকিস্তানের কয়েকটি বিষদাঁত ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে।

দশ বছর ধরে পাকিস্তান আমেরিকা, চীন ও অন্য সব দেশের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধের সরঞ্জাম বাড়িয়ে তুলেছে। এই সব অস্ত্র আমাদের অস্ত্রের তুলনায় যদিও উন্নত ধরণের তবু আমাদের জওয়ানদের বীরত্বের কাছে পাকিস্তানের সব আয়োজন চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমাদের নিজেদের কারখানায় তৈরি বিজয়ন্ত ট্যাংক ও অন্য সব অস্ত্র পাকিস্তানকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

এই যুদ্ধে আমরা পাকিস্তানের ৭৪০ বর্গমাইল এলাকা

দখল করেছিলাম। আর পাকিস্তান দখল করেছিল ভারতের মাত্র ২৫০ বর্গমাইল। আমাদের কথা নয়, আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের খবরের কাগজেই বেরিয়েছে যে ভারতের চেয়ে পাকিস্তানের অনেক অনেক বেশি লোক মরেছে ও অস্ত্র ধ্বংস হয়েছে।

ভারতের এই যুদ্ধ জয়ের উপচার ছিল নির্ভুল নেতৃত্ব, অনুপম শৌর্য আর অটুট মনোবল। সেদিনের নেতা আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীযশোবন্তরাও বলবন্তরাও চব্যন এবং তিন সেনাপতি সর্বাধিনায়ক জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী, এয়ার মার্শাল অর্জন সিং ও ভাইস অ্যাডমিরাল ভাস্কর সদাশিব সোমান। যে সব বীর সেনানী মাতৃভূমির সম্মানের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন দেশের ইতিহাসে তাঁদের নাম চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

॥ তিন সেনাপতি ॥

জয়ন্ত নাথ চৌধুরী

আমাদের এই বাংলাদেশেরই ছেলে জয়ন্তনাথ চৌধুরী। ডাক নাম মুচু। আজকের পৃথিবীতে তার সমান দক্ষ সেনাপতি খুব কমই আছেন।



জয়ন্ত নাথ চৌধুরীর কীর্তি কাহিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ে। জীবনে কোন

যুদ্ধে তার পরাজয় হয়নি। জয়লক্ষ্মী সব সময়েই এই অপরাজেয় নেতার পাশে পাশে ছিলেন।

জয়ন্তনাথের জন্ম ১৯০৮-এর ১০ই জুন। আদি নিবাস ছিল পাবনায়। প্রাথমিক শিক্ষা ক'লকাতায় পরে লণ্ডনের হাই গেট স্কুলে। জয়ন্তনাথের পিতা ৺অমিয়নাথ ছিলেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার। মাতা প্রমীলা দেবী জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি দেশবরেণ্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। বরণীয় সাহিত্যিক ৺প্রমথনাথ চৌধুরী (বীরবল) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীর বৈমানিক ৺কালী চৌধুরী এই বংশেরই সন্তান।

জয়ন্তনাথ ১৯২৮ সালে কুড়ি বছর বয়সের সময় রয়েল মিলিটারী কলেজ থেকে সামরিক শিক্ষা শেষ করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তারপর ৩৮ বছরের সৈনিক জীবনে শুধুই জয়ের অভিজ্ঞতা।

স্বাধীন ভারতে জেনারেল জে, এন, চৌধুরীর ডাক পড়েছে প্রহরে প্রহরে—সব বড় বড় সংকটে। জয়ন্তনাথের হাতে নেতৃত্ব একথা শুনে শুধু সেনাবাহিনীর লোকজনই নয় সারা দেশই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

স্বাধীনতার আগে জয়ন্তনাথ ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সুদান, ইরিত্রিয়া, আবিসিনিয়া এবং পশ্চিম মেরু অঞ্চলের নানা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয়

দেন। এরপরে তাঁর ডাক পড়ে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে, সেখান থেকে ইন্দোচীন এবং জাভায়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার সময়ও জয়ন্তনাথ সামান্য একজন ব্রিগেডিয়ার। কিন্তু পনের বছরে নানা কৃতিত্বের সোপান বেয়ে তিনি ১৯৬২ সালের নভেম্বরে ভারতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে উন্নীত হলেন। পৃথিবীতে আর কোন সৈনিক এত তাড়াতাড়ি এত বড় হয়েছেন কিনা সন্দেহ।

সেদিন কম্যুনিষ্ট চীনের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের সময় স্থল বাহিনীর অধ্যক্ষতা গ্রহণের জন্য জেনারেল চৌধুরীর যখন ডাক পড়ল তখন হঠাৎ আক্রমণে ভারতের জওয়ানদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। কিন্তু জয়ন্তনাথের নেতৃত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই হৃত মনোবল ফিরে আসে। ভারতীয় স্থল বাহিনীর বর্তমান অধ্যক্ষ কুমার মঙ্গলম তাই জয়ন্তনাথের কৃতিত্বের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, "যে কোন সেনাপতির পক্ষে কঠিনতম কর্তব্য হৃত মনোবল বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ। যাঁরা সেই কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পেরেছেন জেনারেল চৌধুরী সেই সামান্য কয়েকজন সেনানীদের অন্যতম।"

জীবনের সমস্ত যুদ্ধের জয়ী সেনানী জয়ন্তনাথ বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জয় তাঁর সৈনিক জীবনে শেষ

জয়। আর সেটাই জীবনের সেরা বিজয়। কারণ এ লড়াই নিজের মাতৃভূমির ডাকে, নিজেরই দেশরক্ষার পবিত্র শপথে অনুপ্রাণিত হয়ে।

জয়ন্তনাথ ১৯৬৬ সালের ৮ই জুন সামরিক কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ উপাধি দিয়ে প্রাপ্য মর্যাদায় সম্মানিত করেছেন। জয়ন্তনাথ এখন দক্ষিণ আমেরিকার কানাডা রাজ্যে ভারতের হাই কমিশনার। আর ভারতের স্থল বাহিনীর অধ্যক্ষ যিনি হলেন, সেই জেনারেল কুমারমঙ্গলমও জেনারেল চৌধুরীর হাতে গড়া। তাঁর সাহচর্যে অনুপ্রাণিত একজন সুযোগ্য সৈনিক।

অর্জন সিং

ভারত পাক-বিমান যুদ্ধে আমাদের বিমান বাহিনী তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে, একথা জোর গলায় বলা চলে।



ভারতীয় বিমান বাহিনীর ছিপছিপে তেজী ছেলেরা পাকিস্তানের মনে মৃত্যুভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। দক্ষতায় এঁরা চিতাবাঘের মত সাহসী ও চটপটে, লক্ষ্যে

অব্যর্থ, আঘাতে প্রবল পরাক্রমশীল। এই উড়ন্ত চিতা বাহিনীকে গড়ে গিয়েছেন প্রাক্তন এয়ার মার্শাল স্বর্গত সুব্রত মুখার্জী। আর এবার এঁদের নেতৃত্ব করেছেন এয়ার মার্শাল অর্জন সিং।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দিল্লীর লাল কেল্লায় যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন ঠিক সে সময় আকাশ থেকে অভিবাদন জানানোর জন্য যে সব বিমান উড়ে যায় অর্জন সিং ছিলেন তার নেতা।

অর্জন সিংয়ের জন্ম পাঞ্জাবের লায়ালপুরে ১৯১৯ সালের ১৫ই এপ্রিল। ১৯ বছর বয়সে তিনি পাইলট ট্রেনিং নেন। ১৯৩৯ সাল থেকে তিনি আকাশে আকাশে বিমান লড়াই করে চলেছেন।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি গ্রুপ ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হলেন। এরপরে নিজ কৃতিত্বে ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি দেশের প্রধান বিমান অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন।

পাইলট হিসাবে অর্জন সিং এক ইঞ্জিন থেকে শুরু করে বহু ইঞ্জিনের ষাট রকমের বিমান চালিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার বিমান হাণ্ট থেকে আধুনিক ন্যাট বিমান চালানো তাঁর নখদর্পণে।

খেলাধূলার ক্ষেত্রেও অর্জন সিংয়ের নাম ডাক আছে। সাঁতার ও অ্যাথলেটিকসে তিনি অনেক রকর্ড করেছেন। ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকে তিনি ভারতীয় দলের 'চিফ অব মিশন' ছিলেন।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে বিমান বহর পরিচালনায় অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী অবসর নেওয়ার পর অর্জন সিং তাঁর জায়গায় সেনানী মণ্ডলীর নতুন সভাপতি হয়েছেন।

ভাস্কর সদাশিব সোমান



এবারের ভারত-পাক যুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনীর কৃতিত্বও কম নয়। আমাদের নৌবাহিনীর কৌশলেই

পাকিস্তানী রণতরী এবং জাহাজ করাচী ও চট্টগ্রামের বন্দরে কিভাবে আটক পড়ে থাকে, সে দেশের নৌবাহিনী কেমন অকর্মণ্য অবস্থায় পড়ে ছিল—এর সব খবর পরে প্রকাশ পায়। আমাদের স্থল ও বিমান বাহিনীর জওয়ানদের মত নৌবাহিনীও গৌরবের সঙ্গে দেশ রক্ষার পবিত্র কর্তব্য পালন করেছেন। আর এই গৌরব অর্জনের মূলে রয়েছেন নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ ভাইস অ্যাডমিরাল ভাস্কর সদাশিব সোমানের প্রেরণা।

সেমানের জন্ম ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে, গোয়ালিয়র শহরে। ১৯৩১ সালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে 'ডাফরিন' রণতরীতে শিক্ষালাভের জন্য তিনি বিলেত যান। তিন বছর পরে তিনি দেশে ফিরে এলেন সাব লেফটান্যাণ্ট হয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি ফাস্ট লেফটান্যাণ্ট। ১৯৩৯-৪০ সালে রণতরী কর্ণওয়ালিসের কম্যাণ্ডিং অফিসার হিসেবে তার উপর ভার পড়ল লোহিত সাগর ও পারশ্য উপসাগরের টহলদারির নেতৃত্ব।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন কমিটির সদস্য হিসাবে সোমান ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নৌবহর ভাগাভাগির জটিল কাজটি সম্পন্ন করেন।

১৯৪৯ সালের অক্টোবরে সোমান আজকের ভারতীয় নৌবহরের অগ্রদূত "আই-এম-এস যমুনার" কম্যাণ্ড প্রাপ্ত হন। সেদিন 'যমুনা' পারস্য উপসাগর, মালয় ও পূর্ব আফ্রিকার বহু দেশে শুভেচ্ছা মিশনে যাত্রা করে। ১৯৬০ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬২ সালের ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতীয় নৌবহরের ফ্লাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং। ১৯৬১ সালে গোয়া অভিযানের সময় তিনি ছিলেন নৌ-অভিযানের কমাণ্ডে। এটাই তাঁর সেনা জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তাঁর আর একটি কৃতিত্ব হল, তিনিই প্রথম এবং একমাত্র সিনিয়র নৌ-অফিসার ছিলেন যিনি ভারতীয় নৌ-বহরের প্রশাসনমূলক এবং সক্রিয় চারটি বিভাগেই কমাণ্ডারের কাজ করেছেন।

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে তিনি ভাইস অ্যাডমিরাল শ্রী এ. কে. চ্যাটার্জীকে কর্তব্য ভার বুঝিয়ে দিয়ে সেনাকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

মৃত্যুহীন প্রাণ

পাকিস্তানের আক্রমণ থেকে মাতৃভূমির মর্যাদা ও দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে ভারতের যে সব বীর তরুণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মাহুতি দিয়েছেন, হৃদয়কে ফুলের মত দেশের মাটিতে উৎসর্গ করেছেন, নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে আপন কর্তব্যবোধের দুর্জয় সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন, তাঁদের অমিত শৌর্য, অকুতোভয়, তেজস্বিতা এবং মরণপণ সঙ্কল্পকে চিরদিন দেশ স্মরণ করবে। ভারতের সামরিক ইতিহাসে এই মরণজয়ী তরুণদের পরাক্রমের গৌরব গাঁথা যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রাণে বল যোগাবে, প্রেরণা দেবে, আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করবে।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সম্মুখ সমরে যে মৃত্যু, সে মৃত্যু গর্বের, গৌরবের। এই মৃত্যু যাঁরা বরণ করেন সমস্ত দেশ শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছায় তাদের হৃদয় সিংহাসনে অভিষিক্ত করে। এ রকম অজস্র মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তানলাভের সৌভাগ্য যে দেশের ও জাতির—সে দেশ ধন্য, সে জাতি ধন্য।

যাঁরা জীবন দিয়ে জীবনকে জয়ী করেছেন দেশের সেই বীর শহীদরা চিরস্মরণীয়।

আবদুল হামিদ

পরমবীর আবদুল হামিদ লাহোর খণ্ডে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্বের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তিনি একাই তাঁর কামানের সাহায্যে তিনটি পাকিস্তানী ট্যাংক ধ্বংস ও আর একটিকে অকেজো করেন।



যুদ্ধে যাওয়ার আগে বাড়ির লোকদের ছেড়ে হামিদ সাইকেলে স্টেশনের পথে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর সাইকেলের টায়ারটি গেল ফেটে। হামিদের কী জানি কী মনে হল। বন্ধুদের বললেন, "এবার বোধ হয় আর ফিরে আসছি না।"

তাঁর ওই কথাই সত্যি হল। মাতৃভূমির বুক থেকে শত্রু হঠাতে গিয়ে হামিদ যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিয়েছেন।

আবদুল হামিদের জন্ম ১৯৩৩ সালের ১লা জুলাই—উত্তর প্রদেশের গাজিপুরে। সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ১৯৫৪ সালে। একে একে ল্যান্স নায়েক, নায়েক,

হাবিলদার প্রভৃতি পদ থেকে তিনি মৃত্যুর কয়েক মাস আগে কোয়ার্টার মাষ্টার পদে উন্নীত হন।

১৯৪৬ সালে তের বছরের ছেলে হামিদ তখন কলকাতায়। 'শহরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেঁধেছে। ছোট্ট ছেলেটি তার কী জানে? বাড়ী থেকে পথে বেরিয়ে একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি পড়ল। কিন্তু এক হিন্দু হোটেল মালিক সেদিন নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও হামিদকে বাঁচিয়েছিলেন। অচেনা-অজানা এই মানুষটির জন্য হামিদ প্রাণ ফিরে পেয়ে অবাক হয়ে যায়। আনন্দে তার চোখের জল পড়তে লাগল। সেই ব্যক্তির চেষ্টাতে ও টাকা পয়সায় হামিদ নিরাপদে বাড়ী ফিরতে পারে। এই ঘটনাই হামিদের জীবন-বেদ হয়ে চিরদিন তাকে পথ নির্দেশ করেছে। সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে বড় জাতীয় সংহতির দীক্ষা তিনি ওই হোটেল মালিকের কাছেই পান।

হামিদের পরিবারের আর সকলেই দর্জি ও কুস্তিগীর। হামিদ কিন্তু স্বপ্ন দেখতেন সৈনিক হওয়ার। ছোটবেলা থেকেই হামিদ পাকা সৈনিক। কুস্তি আর লাঠি খেলায় তার জুড়ি ছিল না। একজন শিকারী হিসাবেও তিনি সুদক্ষ। একবার রাতের অন্ধকারে শুধুমাত্র গলার আওয়াজ শুনেই তিনি একটা পেঁচাকে গুলিবিদ্ধ করে ছিলেন।

১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত হামিদ ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরে। এই সময় কর্তব্য পালনে কৃতিত্ব দেখানোর জন্য তিনি 'সৈন্য-সেবা' পদক লাভ করেন। ১৯৬২ সালে নেফা রণাঙ্গণেও তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন।

হামিদ মাঝে মাঝে বন্ধুদের কাছে বলতেন, "সেনাদলে যখন যোগ দিয়েছি তখন চূড়ান্ত একটা কিছু করবই।" একথা তিনি রেখে গিয়েছেন। হাবিলদার হামিদকে ভারত সরকার সাহসিকতার সর্বোচ্চ সম্মান 'পরমবীর চক্র' দিয়েছেন। বর্তমান যুদ্ধে হামিদই সবার আগে সম্মান পান।

যুদ্ধে যাওয়ার আগে হামিদ তাঁর ছেলেদের বলে গিয়েছিলেন, "ফিরে আসার সময় তোমাদের জন্য আমার বন্দুকটা বাড়িতে নিয়ে আসব"।

হামিদের চার ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলের নাম জৈন-উল-হাসান—বয়স—১৩। লেখক এবং সাংবাদিক শ্রীহায়াত আনসারিকে, হাসান বলেছে, "আমরা চার ভাই বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবই নেব"—হ্যাঁ খাঁটি বাপকা বেটার মতই কথা বটে !

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

সুন্দর ফুটফুটে দামাল ছেলে অভিজিৎ। ১৯শে আগষ্ট কাশ্মীরের কারগিলে চব্বিশ বছরের এই তরুণ যোদ্ধা পাকিস্তানী হানাদারদের তাড়িয়ে দেওয়ার কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছেন।



নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। দেশপ্রেমের দীক্ষা তার ছোট বেলা থেকেই। বাবা শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় বরেণ্য দেশসেবক। এখন ভারতের লোক সভার সদস্য। স্নেহময়ী মাতা শ্রীমতী প্রীতি চট্টোপাধ্যায়ও নানা সমাজ-কল্যাণ কর্মের সঙ্গে যুক্ত। পিতামাতার একমাত্র পুত্র অভিজিৎ দেশপ্রেমের প্রেরণা মা বাবার কাছ থেকেই পেয়েছেন। শিশু অভিজিতের বয়স যখন মাত্র একমাস, সেদিন হরিপদবাবু স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অভিযোগে ইংরাজের কারাগারে।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীনারা যখন ভারত আক্রমণ করল তখন হরিপদবাবু বৃদ্ধ হয়েও নিজেই যুদ্ধে যেতে চেয়েছিলেন। অভিজিৎ সেদিন সবে আশুতোষ

কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেছেন। পিতার ইচ্ছায় অভিজিৎ ১৯৬৩ সালে সেনাবাহিনীর জরুরী কমিশনে যোগ দিলেন। চতুর্থ রাজপুত রেজিমেন্টের অধীন ১৬ জনের একটি দলের তিনি নেতৃত্ব করেন।

১৯৬৫ সালের মে-জুন মাসে যে দুঃসাহসী দলটি কারগিল ঘাঁটি দখল করে, অভিজিৎ সেই দলে ছিলেন। দু'মাস পরে এই কারগিল যুদ্ধেরেই সেকেণ্ড লেফটান্যাণ্ট অভিজিৎ লড়তে লড়তে প্রাণ দিলেন।

একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর খবর পেয়েও হরিপদবাবু ভেঙে পড়েন নি। অভিজিতের আট মাসের ছেলেকে বুকে চেপে ধরে গর্বের সঙ্গে হরিপদবাবু বলেছেন, "অভিজিতের বীরের মতই মৃত্যু হয়েছে! আমিই তাকে সেনাবাহিনীতে ঢুকতে উৎসাহিত করেছিলাম।"

অভিজিতের স্ত্রী জয়ন্তীও সাহসের সঙ্গে বুক বেঁধে স্বামীর মৃত্যু শোক সহ্য করেছেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পরেই অভিজিৎ রণাঙ্গণে চলে গেলেন। শেষ দেখার সময় অভিজিৎ স্ত্রী জয়ন্তীকে বলেছিলেন, "তোমাকে শিগ্‌গিরই শ্রীনগরে নিয়ে যাব।" ১৯শে আগষ্ট জয়ন্তী অভিজিতের কাছ থেকে শেষ চিঠি পান। লিখেছেন, "তুমি আমার সঙ্গে যেখানে আসতে চেয়েছিলে সেখান থেকে লিখছি।"

শ্রীনগরে আর অভিজিৎ জয়ন্তীকে নিয়ে যেতে পারেন নি। সেই রাত্রেই অভিজিৎ শত্রুর হাতে জীবন দিলেন।

অভিজিতের মৃত্যুর পর জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী হরিপদবাবুর কাছে এক শোকবাণী পাঠিয়ে বলেছেন, "অভিজিতের মৃত্যুতে আমার এবং সেনাবাহিনীর সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শোকপ্রকাশ করছি। আপনার পুত্র দেশ মাতৃকার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, একজন সৈনিকের পক্ষে এই মৃত্যু মহান।"

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন হরিপদবাবুর কাছে এক শোকবার্তা পাঠিয়ে বলেন, "কাশ্মীরের কারগিলে এই তরুণ যোদ্ধা শহীদ হয়েছেন। তাঁর এই মৃত্যু পশ্চিমবঙ্গ এবং সামগ্রিকভাবে ভারতের কাছে গৌরবের। অভিজিতের মৃত্যুর যে শোক এ শুধু আপনার একার শোক নয়—সমস্ত দেশের। ভগবান আপনার সহায় হোন!"

এক ১০ই সেপ্টেম্বর ছিল অভিজিতের জন্ম। তার ঠিক চব্বিশ বছর পর আর এক ১০ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে আসা হয়। অভিজিতের মৃত্যুর মত মহান মৃত্যুর সামনে দাঁড়ালে বাক্য স্তব্ধ হয়ে আসে। মাথা আপনা-আপনি শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়ে।

প্রার্থনা জানাই, তাঁর দীপ্ত জীবন দেশের তরুণদের প্রেরণার উৎসস্বরূপ হোক!

তপন কুমার চৌধুরী

বাংলা মায়ের আর একজন বীর সন্তান ভারতীয় বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটান্যাণ্ট তপনকুমার চৌধুরী। ১৯৬৫-র ১৫ই সেপ্টেম্বর এই বীর বৈমানিক লাহোর-শিয়ালকোট রণাঙ্গণে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন।



তপন কুমারের পিতা শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী কলকাতা হাইকোর্টের একজন অ্যাড-ভোকেট। তপনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কয়েকজন খবরের কাগজের রিপোর্টার শোকাহত পিতার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন, "আমি আমার পুত্রের জন্য গর্বিত! সে তার কর্তব্য সম্পন্ন করেছে। দেশ ও জাতির জন্য সে গৌরবময় মৃত্যুবরণ করেছে।"

তপনের ডাক নাম ছিল মিন্টু। ছোটবেলায় সে খুব ভাল অভিনয় করতে পারত। অনেক থিয়েটার ও সিনেমায় অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছে। পিতা মাতার তৃতীয় পুত্র তপনের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল মাত্র আঠাশ বছর। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই তপনের বাসনা ছিল আকাশে ওড়ার। দশ বছর বয়সেই তাঁকে দেরাদুনের রয়েল মিলিটারী কলেজে ভর্তি করা হয়। ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাকাডেমি থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর ১৯৫৫ সালে তপনকুমার ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগ দেন।

পরে তপনের আর একটি আকাঙ্ক্ষা হয় মহাকাশচারী হওয়ার। রাশিয়া ও আমেরিকায় কত যুবক-যুবতী চাঁদে অভিযানের জন্য মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছেন, ভারতে কেন এমন হবে না? তপনের ইচ্ছা ছিল ভারতবাসীর মধ্যে তিনি প্রথম মহাকাশচারী হবেন। এ ব্যাপারে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য তিনি সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিলেন। কথা ছিল ৪ঠা সেপ্টেম্বর মস্কো যাবেন। সেইমত তপন কুমার বাবাকে চিঠি লেখেন, "বাবা, সীট বুক করা হয়েছে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মস্কো যাচ্ছি। পরের চিঠি মস্কো থেকে লিখব, কোন চিন্তা কোরো না।"

কিন্তু মস্কো তার আর যাওয়া হয় নি। আটদিন পরে বাবার কাছে আবার তপনের চিঠি এল, "আমার মস্কো যাওয়া হল না। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হল। মায়ের বাড়িতে পূজো দিও।" তপনদের বাড়িতে প্রথা আছে যে শুভ কাজ করার আগেই কালীঘাটে পূজো দেওয়া।

তপন বাবার কাছে শেষ চিঠি লেখেন ১২ই সেপ্টেম্বর। "বাবা, আমরা ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে শত্রু ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাচ্ছি। প্রত্যেকবার আমরা উঁচু আকাশ দিয়ে চলাচল করছি। আমরা পাকিস্তানী ট্যাংক গুঁড়িয়ে দিয়েছি, একের পর এক শত্রুর সামরিক আস্তানাগুলি ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছি।

আমি মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার জন্য আমার পবিত্র দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছি।

শত্রু আমার বিমানটির গায়ে একটি আঁচড়ও কাটতে পারেনি। মা-কালীর আশীর্বাদ ও আমার বাবা-মার আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হচ্ছে। আমার উদ্দেশ্য সাধনের পথে এই আশীর্বাদই বড় কথা। তোমরা আমার জন্য প্রার্থনা করো যাতে প্রত্যেকদিন আমি শত্রুদের পঙ্গু করে দিতে পারি।

৫ই সেপ্টেম্বর থেকে একটুও বিশ্রাম নিইনি। সেদিন থেকে আজ হল মোট বারদিন। তুমি সবাইকে বলো, তারা যেন আমাকে চিঠি দেয়। চিঠিগুলি আমাকে উৎসাহ দেবে। দেশের জন্য জাতির জন্য আমি আমার কর্তব্য করে যাব। মাকে আলাদা চিঠি দিলাম না। তুমি মাকে বলো তাঁর তৃতীয়পুত্র সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছে।

এখন আর সময় নেই। এখন আমাকে আকাশে উঠতে হবে—উদ্দেশ্য শত্রু হনন। সে এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর ব্যাপার।”

তপন আর চিঠি লিখবেন না। চিঠিটা যখন বাবার হাতে পৌঁছায় তার অনেক আগেই তপন শহীদের জয়মাল্য গলায় পরে অমরলোকে চলে গিয়েছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর ছামবের আকাশযুদ্ধে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। বহু শত্রুবিমান ধরাশায়ী করে তিনি যখন সামনের দিকে চলেছেন ঠিক সে সময়েই তাঁর বিমানে এসে গুলি লাগল। তবু তিনি ধরা দেননি। আহত অবস্থাতেও ক্ষতিগ্রস্ত বিমানটিকে নিরাপদে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে এনেই বরণ করলেন বীরের মৃত্যু।

পরমবীর তারাপোরে

ভারত-পাক লড়াইয়ে সব থেকে বড় ট্যাংক যুদ্ধ হয়েছে শিয়ালকোট খণ্ডের ফিলোরায়। প্যাটন ট্যাংকের মাথায় বসে পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ আমাদের রাজধানী দিল্লীর রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে আশা বরবাদ হয় এই ফিলোরাতেই।



ফিলোরা যুদ্ধে ভারত অনেক বীরের সাক্ষাৎ পায়। তবে বীরের মত বীর ছিলেন লেফটান্যাণ্ট কর্ণেল এ. বি. তারাপোরে। এখানকার যুদ্ধে শুধু একটি দিনেই আমাদের ৬টি আর পাকিস্তানের ৬৭টি ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে। এই যুদ্ধে আমাদের জওয়ানদের সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল সামগ্রিক রণকৌশল এবং পদাতিক বাহিনীর অসম সাহসিকতা। অতুলনীয় বীরত্বের জন্য তারাপোরেকে পরম বীরচক্র দেওয়া হয়েছে।

১১ই সেপ্টেম্বর শিয়ালকোট খণ্ডের ফিলোরা দখলের যুদ্ধে তারাপোরেকে সশস্ত্র আক্রমণের ভার দেওয়া হয়। তিনি সৈন্যদল নিয়ে ফিলোরা ও চাওইন্দারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। ফিলোরাকে চাওইন্দা থেকে বিচ্ছিন্ন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

আচমকা আক্রমণই ছিল তারাপোরের সবচেয়ে বড় কৌশল। শত্রু সৈন্যও হঠাৎ ওয়াজিরওয়ালি থেকে প্রচণ্ডভাবে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানী সৈন্য-বাহিনীতে প্রচুর ট্যাংক ও ভারী কামান ছিল। কিন্তু তারাপোরে তাঁর রেজিমেণ্ট নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃঢ়তা ও সাহস দেখে গোটা সৈন্যদলের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনা দেখা দিল। পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও ভারতীয় জওয়ানরা ফিলোরা আক্রমণ করে।

শত্রুদের কামানের গোলায় তারাপোরে ভীষণভাবে আহত হলেন, তবু তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। আহত অবস্থাতেই তিনি রেজিমেণ্ট পরিচালিত করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি ওয়াজিরওয়ালি দখল করেন। দু'দিন বাদে যশোয়ান ও বুতুর ডোগরাণ্ডাই ভারতের দখলে আসে। তারাপোরের নিজের ট্যাংকের উপরও বেশ কয়েকটি গোলা এসে পড়ে। কিন্তু তাঁকে কিছুতেই দমানো

যায় নি। শেষপর্যন্ত তাঁর অনুপম নেতৃত্বের জয় হল। তারাপোরের সহ যোদ্ধারা অন্তিম শয্যায় শায়িত এই নেতাকে জানাল, "স্যার, ফিলোরা হামারা!" ফিলোরার বিজয় মুকুট মাথায় নিয়ে তবে তারাপোরে শান্তিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

প্রবাল রায়

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে আর একজন তরুণ বাঙালী সামরিক অফিসার আত্মাহুতি দেন, তিনি হলেন ক্যাপ্টেন প্রবাল রায়।

ক্যাপ্টেন প্রবালের বয়স হয়েছিল মাত্র ২৯ বছর। সৈন্যবাহিনীর সদর দপতর থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় তাঁর মা শ্রীমতী বাসন্তী রায়ের কাছে একটি তারবার্তা প্রথম এই মর্মান্তিক সংবাদ বহন করে নিয়ে এল, "আপনার প্রিয় পুত্র গত ২০শে সেপ্টেম্বর রণক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন।"



প্রথম এই সংবাদটি অল্প কয়েক লাইনের ছিল মাত্র। পরে এই মহান মৃত্যুবরণের বিস্তারিত কাহিনী জানা যায় প্রবালের এক জ্যাঠতুতো ভাইয়ের চিঠিতে। তিনিও সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। তিনি কাকীমার কাছে চিঠি লিখে জানান, "বাবু (প্রবালের ডাক নাম) আর

নেই! আমি জানি এতে আপনি প্রচণ্ড আঘাত পাবেন। কিন্তু আপনাদের ভবিষ্যতের জন্য যে সে তার বর্তমানকে বিসর্জন দিয়েছে, একথা ভেবে নিশ্চয়ই আপনি সান্ত্বনা পাবেন।"

প্রবালের মৃত্যু বরণের তিনটি কাহিনী শুনে তিনি বাড়ির লোককে জানিয়েছেন। প্রথম কাহিনী হল সেদিন লাহোরের রণাঙ্গণে পাকিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি আক্রমণ করার কথা। প্রবালের ব্যাটেলিয়ানের উপর পড়ে সেই ভার। আমাদের সৈন্যদলের অভিযান যখন সাফল্যের মুখে, তখন তিনজন লোকে এসে বলে, "আমরা চতুর্দশ রাজপুত রেজিমেণ্টের লোক, আমাদের গুলি কর না।"

একথা শুনে প্রবাল তাদের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ান। আর হঠাৎ ওদের দু'জন ছুটে এসে প্রবালের দু'হাত ধরে ফেলে এবং তৃতীয় জন কাপুরুষের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রবালের বুকে বেয়োনেট বসিয়ে দেয়। সেই সময় প্রবাল বুঝতে পারল ওই তিনজন হল পাকিস্তানী সৈন্য। প্রবাল শেষবারের মত 'জয়হিন্দ' উচ্চারণ করে মৃত্যুর কোলে চলে পড়েন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাহিনীটা মোটামুটি একরকমের। প্রবাল সেদিন তার ইউনিটের পথপ্রদর্শক হিসাবে

পাকিস্তানের একটি ঘাঁটি দখল করার পর হঠাৎ পাক বাহিনীর একটি গোলায় তিনি মারা যান।

প্রবাল ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার ছেলে। তাঁর বাবা নীরদকুমার রায় ক্রীড়া জগতের একজন বিখ্যাত লোক। একসময় তিনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বছর আগে তিনি মারা গিয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এসসি. পাশ করে প্রবাল ১৯৫৫ সালে দেরাদুন মিলিটারী কলেজে যোগ দেন। তারপর ১৯৫৭ সালে তিনি দ্বিতীয় লেফটান্যান্ট হিসাবে সামরিক বিভাগে যোগ দিলেন। চার বছর জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় তিনি নেফা সীমান্তে যুদ্ধ করেন। পরে তাঁর ডাক পড়ে ডাইরেক্টরি অব মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে। সাম্প্রতিক যুদ্ধে তিনি জম্মু অ্যাণ্ড কাশ্মীর রাইফেলস্ বাহিনীতে যোগ দেন।

প্রবালের খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো আরও পাঁচটি ভাইও ভারতের সামরিক বাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত আছেন।

ভাস্কর গুহরায়

অভিজিৎ-তপন-প্রবালের মতই ভাস্বর আর একটি নাম—ভাস্কর গুহরায়। বাইশ বছরের এই তরুণ জেট জঙ্গী বিমানের বীর বৈমানিক ছিলেন, ভারতের বিমান বহরের ফ্লাইট লেফটান্যাণ্ট। ৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম রণাঙ্গণে যুদ্ধ করতে করতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে ভাস্কর নিজে অমর হয়েছেন আর বাঙালীর ললাটে গৌরবের জয়টিকা এঁকে দিয়ে গিয়েছেন।



বরিশালের শ্রীরবি গুহরায়ের পুত্র ভাস্কর ছোট থেকে বড় হয়েছেন মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর শহরে।

১৯৬১ সালে তিনি ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিমান চালনায় তাঁর অপূর্ব দক্ষতা দেখা গেল এবং ১৯৬৪ সালে তিনি হলেন জেট জঙ্গী বিমানের বৈমানিক। জঙ্গী বিমান চালনায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন এবং বিশেষ

ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে আসার মাত্র পাঁচ মাস পরে ভাস্করের মৃত্যু হল।

অতর্কিতে শত্রু যখন আন্তর্জাতিক সীমা রেখা অতিক্রম করে এগিয়ে এল, জেট জঙ্গী বিমান নিয়ে শত্রুর দর্পচূর্ণ করেছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর বহু কৃতী বৈমানিক। এদের পথিকৃৎ হলেন ভাস্কর। তিনি একাকী ছাম্বের রণক্ষেত্রে পাকিস্তানের বহু বিমান আর প্যাটন ট্যাংক ধ্বংস করেছেন। তাঁর চমৎকার রণকৌশলের কথা আজ সেনাবাহিনীর সকলেরই মুখে মুখে।

দেশ ও জাতির সম্মান রক্ষায় ভাস্করের নিঃশেষে প্রাণ বলিদানের কাহিনী শুনে সেদিন সারা দেশ একবাক্যে বলে উঠেছিলেন—ধন্য ভাস্কর, ধন্য তাঁর বীরত্ব, সার্থক তাঁর আত্মদান।

চিরদিন দেশের তরুণ সমাজ ভাস্কর ও তাঁর সহকর্মীদের পরম কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। বুকে বল পাবে। মহত্তর আদর্শে ও কর্মে সঙ্কল্পবদ্ধ হবে।

অসিতকুমার ঘোষ

দেশ মাতৃকার পূজায় আর একজন বাঙালী তরুণ নিজের প্রাণ অঞ্জলি দিয়েছেন—তিনি হলেন স্কোয়াড্রন লীডার শ্রীঅসিত কুমার ঘোষ। পাকিস্তানের সঙ্গে বিমান-যুদ্ধে তিনি মৃত্যুবরণ করে সামরিক শৌর্যের ইতিহাসে এক গৌরব-ময় স্থান অধিকার করেছেন।



অসিতকুমার ছিলেন প্রবাসী বাঙালী। উত্তর প্রদেশের লখনউ শহরের বিশিষ্ট ঘোষ পরিবারের সন্তান তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩২ বছর। অসিত-কুমারের পিতা কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গিয়েছেন মা, স্ত্রী, ভাই, বোন আর এক বছরের একটি পুত্র সন্তান।

লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে অসিতকুমার ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালের

নভেম্বর মাসে তিনি কমিশন পান। হাণ্টার বিমান শিক্ষানবিশীর প্রথম দলের তিনি ছিলেন অন্যতম। কৃতিত্বের সঙ্গে বিমান যুদ্ধ শেষ করে তিনি পাইলট ফাইটার নিযুক্ত হন।

বহু কৃতিত্বের অধিকারী অসিতকুমার ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় নেফা অঞ্চলে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। সেদিনের এয়ার ভাইস মার্শাল স্বর্গত যশোবন্ত সিং মুক্তকণ্ঠে অসিতকুমারের প্রশংসা করেন।

এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় জীবনের এই আকস্মিক পরিণতিতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বিমান বাহিনীর প্রধান শ্রীঅর্জন সিং অসিতকুমারের স্ত্রীর কাছে সমবেদনা জানিয়ে এক বার্তা পাঠান। এই শোকবার্তায় তিনি বলেন, "আপনার প্রিয় স্বামী স্কোয়াড্রন লীডার ঘোষের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমি মর্মাহত! অল্পদিনের এই কর্মজীবনেইতিনি অসীম সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সহকর্মীদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে একটি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ জীবনের অকস্মাৎ পরিসমাপ্তি ঘটল। তাঁর মত এক বীরের সেবা থেকে দেশ বঞ্চিত হল। আপনার এই পরম দুঃখের দিনে আমার নিজের এবং সমস্ত বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে সুগভীর সমবেদনা জানাই।"

দুঃখপীড়িতা মা ও স্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে জানিয়েছেন, “আমাদের ক্ষতি অপূরণীয় সন্দেহ নেই, দুঃখও অপরিসীম, তবে সান্ত্বনার কথা এই যে সমগ্র জাতি এই ক্ষতির অংশ ভাগ করে নিয়েছে, দুঃখের অংশও নিয়েছে সমানভাবে।”

পীযূষ কুমার চৌধুরী

এবারের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আর এক মৃত্যুঞ্জয়ী বীর হলেন মেজর পীযূষ কুমার চৌধুরী।

লাহোর রণাঙ্গনের দেশরক্ষার পবিত্র যুদ্ধে উৎসর্গীকৃত প্রাণ মেজর পীযূষ কুমার চৌধুরীর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৬ বছর। ১৯৬৫-র ৭ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী লাহোরে ত্রিশূলী অভিযান চালায়। মেজর চৌধুরী ছিলেন এই অভিযানের অন্যতম নেতা। পাকিস্তানী সৈন্যরাও প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ করে। ছ'দিন অবিরাম যুদ্ধের পর ১৩ই সেপ্টেম্বর মেজর চৌধুরী শত্রু সৈন্যের হাতে নিহত হন।



মৃত্যুর তিনদিন আগে পীযূষের শেষ চিঠি আসে মায়ের কাছে। তাতে তিনি লেখেন, "যুদ্ধে আমাদের জয় সুনিশ্চিত! তুমিও আশীর্বাদ কর যেন আমরা জয়লাভ করি।" আজ মেজর চৌধুরী নেই কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সফল হয়েছে যুদ্ধে আমরা জয়লাভই করেছি।

মেজর চৌধুরীর আদি নিবাস ছিল নোয়াখালিতে। বছর তিরিশ আগে তাঁর পিতা শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী নোয়াখালি থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। তারপর বিহারের দানাপুরে। যোগেশবাবু দানাপুরের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। স্থানীয় বলদেও একাডেমিতে তিনি দীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন।

পীযূষকুমারের স্ত্রী দীপালী চৌধুরী গত বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেন। এক ছেলে এক মেয়ে। মেজর চৌধুরীর মৃত্যুর সময় পুত্র অভিজিতের বয়স মাত্র ছ'বছর। মেয়েটি তিন মাসের শিশু। মৃত্যুর কিছুদিন আগে পীযূষকুমার ছুটিতে দানাপুরের বাসায় আসেন। তখনই তিনি জেনে আসেন তাঁর ফ্রণ্টে যাওয়ার নির্দেশ এসেছে—কয়েকদিনের মধ্যেই ছুটতে হবে।

দানাপুর ও পাটনার মানুষ বীর পীযূষের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার অর্ঘস্বরূপ কিছু টাকা তুলেছিলেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় এই টাকা তুলে দিলেন অভিজিতের হাতে। সেদিন ওই অনুষ্ঠানের লোক আর ধরে না। সেই ভিড়ের মাঝখানে ছ'বছরের ছোট্টছেলে অভিজিৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। করুণ কোমল মমতা মাখা দৃষ্টি নিয়ে সবাই অভিজিতের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে। আবেগে উচ্ছসিত বিপুল জনতা পীযূষকুমারের বীরত্বে

বিমুগ্ধ। মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠছে, "মেজর পীযূষ চৌধুরী জিন্দাবাদ···জিন্দাবাদ!"

পিতা যোগেশচন্দ্রের চোখে জল। কিন্তু তাঁর বীর ছেলের প্রতি জনতার কি অপরিসীম ভালবাসা। এটাই তাঁর পুত্র শোকের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। পৌত্র অভিজিৎকে বুকে জড়িয়ে ধরে যোগেশবাবু মনে বল ফিরে পেলেন।

মহাবীর আশারাম ত্যাগী

আমাদের ওয়াগা সীমান্ত থেকে সাত-আট মাইল দূরে ইছোগিল খালের উপর ছোট্ট শহর ডোগরাই। ১৯৬৫



সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি বলবৎ হওয়ার আগের দু'রাত্রি এখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়ে যায়। এটাই ছিল যুদ্ধ বিরতির আগে ভারত-পাকের শেষ বড় যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে ভারতের জওয়ানদের যে সাহস ও শৌর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা দিয়ে রূপকথা লেখা যেতে পারে। ডোগরাই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বীর ছিলেন মেজর আশারাম ত্যাগী। তাঁকে মরণোত্তর মহাবীর চক্র দিয়ে ভারত সরকার শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। ২৬ বছর বয়স্ক সামরিক অফিসার মেজর আশারাম ত্যাগীর শৌর্য ও জাঠ বাহিনীর অসীম সাহসের জন্যই ইছোগিল খালের পূর্বদিকটা সম্পূর্ণরূপে ভারতের দখলে এসেছিল।

ডোগরাই অঞ্চলে অবস্থিত পাক সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের অগ্রগামী জাঠ বাহিনীর তুমুল লড়াই হয়। এখানে ছোট ছোট দুর্গের মত পিলবক্সের ভেতর বসে পাকিস্তানী সৈন্যরা অগ্রগামী ভারতীয় সৈন্যদের উপর ভীষণভাবে পাল্টা

আক্রমণ শুরু করে। লড়াই শুরু হয় ২১শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে আর ২২শে সেপ্টেম্বর ভোরের আলো দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই লড়াই শেষ হয়ে যায়—পাকিস্তানের সেরা ষোড়শ পাঞ্জাব ব্যাটেলিয়ান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই যুদ্ধে, ধ্বংস হয়ে যায় তাদের এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক ও কামানবহর—ডোগরাই শহর দখল করে নেয় ভারতীয় জওয়ানরা। ডোগরাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখলের ভার দেওয়া হয়েছিল মেজর আশারামের উপর। সৈন্য বাহিনী নিয়ে আশারাম ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যান সমস্ত পাল্টা আক্রমণকে তুচ্ছ করে। মেজর ত্যাগী সদলবলে পাকিস্তানের মেশিনগানের দু'টি ঘাঁটি ও কংক্রিটের একটি পিলবক্স ধ্বংস করে দেন। দু'বার দু'টি গুলিতে আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেই তিনটি ট্যাংকের চালক সৈনিককে নিহত করেন এবং ট্যাংক তিনটি অক্ষত অবস্থায় দখল করেন। মেজর ত্যাগী পাঁচবার গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন কিন্তু সহযোদ্ধাদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে ভুলে গেলেন না। আহত আশারাম হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কিন্তু মৃত্যুর আগে যুদ্ধ জয়ের সংবাদ তিনি শুনে গিয়েছেন।

১৯৬১ সালে মেজর আশারাম সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

মহাবীর এন এন খান্না

১৯৬৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর পুঞ্চখণ্ডে যুদ্ধবিরতি রেখার অপরদিকে পাকিস্তানের হাত থেকে ভারতের যে সেনাদলটি রাজা ঘাঁটিটি দখল করেন সেই সেনাদলের নেতা ছিলেন লেঃ কর্ণেল এন এন খান্না।



উঃ সে কী যুদ্ধ। শত্রু-পক্ষের গুলি ও হাতবোমার আঘাতে কর্ণেল খান্না ভীষণ ভাবে আহত তবু তিনি জয়ী না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। লড়াই করতে করতেই তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে জানতে পারলেন যে ভারতীয় সেনাদল রাজা ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর তবু তাঁর চোখে মুখে বিজয়ের গর্ব ও আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। শেষ কথা বলে গেলেন, "আমার সৈনিকদের আমার হতে ও সাবাস জানাবেন।"

রাজা ঘাঁটি ছিল পাঠান সৈন্যদের নিয়ে গঠিত মিলিশিয়া এবং পাক অধিকৃত দুই পেল্টুন সৈন্যের দখলে। ৫ই সেপ্টেম্বর কর্ণেল খান্নার ব্যাটেলিয়ান নিজ সমাবেশ ছেড়ে

সেই ঘাঁটির দিকে এগিয়ে চললেন। শেষরাত্রের অন্ধকারে ভারতীয় সেনারা মূল ঘাঁটির উপর আক্রমণ করলেন। আমাদের জওয়ানরা যত এগিয়ে চলেন পাকিস্তান বাহিনীর মেশিনগান ও মর্টার থেকে ততই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ হতে থাকে। এমন প্রচণ্ড গুলির মুখে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তবু জওয়ানরা পেছু হটলেন না—প্রাণপণে সামনের দিকে চললেন। বেশ কয়েকজন জওয়ান হতাহত হলেন। কিন্তু তবু লেঃ কর্ণেল খান্না তাঁর বাহিনীকে থামতে বললেন না। সহকর্মীদের মনোবল অটুট রাখার জন্য তিনি নিজেই নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও হাতবোমা নিয়ে এগিয়ে চললেন। তাঁর এই দুঃসাহস জওয়ানদের মনোবলকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলল। সকলেই মরণপণ সংকল্প গ্রহণ করলেন। রাজা ঘাঁটি তারা দখল করবেনই।

শত্রুপক্ষের একটি গুলি কর্ণেল খান্নার বাম হাতে এবং হাতবোমার একটা টুকরো এসে তাঁর কাঁধে লাগল। তবু তাঁকে যুদ্ধ থেকে বিরত করা গেল না। অন্য জওয়ানরা তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে চাইলেন কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। এবার তার উপর গুলিবৃষ্টি হতে লাগল। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আর এগুতে পারলেন না। অন্য জওয়ানদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা গিয়ে রাজা ঘাঁটি দখল করল। যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ

শোনার পরমুহূর্তেই খান্না অনন্ত নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

লেঃ কর্ণেল খান্নার এই অসীম সাহসিকতা ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসাবে সরকার তাঁকে মরণোত্তর মহাবীর চক্র দিয়েছেন।

ক্যাপ্টেন চন্দ্রনারায়ণ সিং

পুঞ্চের মহাবীর চন্দরনারায়ণ সিং প্রমাণ করে গেছেন অনেক সময় ভারতীয় জওয়ানরা একাই একশ' জওয়ানের শক্তি ধরেন। আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে সীমান্ত প্রহরী চন্দরনারায়ণ একদিন চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দেখতে পেলেন যে প্রায় শ' খানেক পাক হানাদার জম্মুর মধ্যে প্রবেশ করছে। এই দলটিই জম্মুতে প্রথম অনুপ্রবেশকারী দল। উদ্দেশ্য রাজ্যের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা।



হানাদারদের গতিরোধ করার জন্য চন্দরনারায়ণ তাঁর ছোট টহলদার বাহিনী নিয়ে পুঞ্চ জেলার ধাবরট গ্রামের দিকে এগিয়ে যান। পাহাড় পর্বত, বন-জঙ্গলের পথ পিচ্ছিল। সূর্য ডুবু-ডুবু—অন্ধকার হয়ে আসছে। এমন সময় এক বিরাট পাক হানাদার দলের মুখোমুখি হলেন তাঁরা। পাকিস্তানী হানাদাররা মেসিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিয়ে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ হানলেন। আচমকা আক্রমণে

চন্দরনারায়ণ কিছুটা থতমত খেয়ে গেলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেটা কাটিয়ে উঠে তিনি সুকৌশলে তাঁর টহলদার বাহিনীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। আপাততঃ তিনি পাল্টা আঘাত না হেনে ঝোপের আড়ালে চুপিসারে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন।

তারপর অন্ধকার নিবিড় হলে চন্দরনারায়ণ অমিত-বিক্রমে পাকিস্তানী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি একাই শত্রুপক্ষের বহু হানাদারকে নিহত করেন। পাকিস্তানী মেশিনগানের গুলিতে তাঁরও জীবনান্ত হয়। তিনি শত্রু ঘাঁটির মাত্র দশগজ দূরে পড়ে যান। সে যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারালেন বটে কিন্তু পাকিস্তানী হানাদারদের হটিয়ে দিয়ে তবে। পাক হানাদারদের বিরাট বাহিনীটি আমাদের ছোট টহলদার বাহিনীটির সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে বন্দুক, গোলাবারুদ রেখে পালিয়ে যায়।

এই বীরত্বের স্বীকৃতি হিসাবে চন্দরনারায়ণকে মরণোত্তর মহাবীর চক্র দেওয়া হয়েছে।

মহাবীর ভূপিন্দর সিং

আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ট্যাংক যুদ্ধ হয় ফিলোরাতে। উত্তর থেকে দক্ষিণে লাহোর এবং শিয়ালকোটের মধ্যে প্রধান যে রেল ও সড়ক বন্ধন ফিলোরাই তার নিয়ন্ত্রক। এর দক্ষিণে গুরুত্বপূর্ণ রেল জংসন পাসরুর।



ফিলোরার যুদ্ধে আমাদের ট্যাংক বাহিনীর অতুলনীয় জয়ের অন্যতম কারণ সামগ্রিক রণকৌশল এবং পদাতিক বাহিনীর অসম সাহসিকতা। কোর কম্যাণ্ডার লেঃ জেঃ প্যাট্রিস ডান উল্লেখ করেছেন উন্নত নেতৃত্ব, উন্নত রণকৌশল উন্নত অস্ত্র শিক্ষা এবং অফিসার ও জওয়ানদের অনন্য দৃঢ়তাই ফিলোরা যুদ্ধে আমাদের জয়লাভের কারণ।

ফিলোরাতে পাকিস্তান ২৪৩টি ট্যাংক খুইয়েছে। এই যুদ্ধের অন্যতম এক বীর হলেন ভূপিন্দর সিং। তিনি তাঁর স্কোয়াড্রন নিয়ে পাকিস্তানী ট্যাংক বাহিনীর মোকাবিলা করেন। তিনি ট্যাংক যুদ্ধে অতুলনীয় সাহস ও বীরত্ব

দেখান। তাঁর স্কোয়াড্রন ২১টি পাক ট্যাংক ধ্বংস করেছে। তার মধ্যে একা ভূপিন্দরই করেছে ৭টি ট্যাংক। কিন্তু যুদ্ধরত অবস্থাতেই ভূপিন্দর শত্রুর গোলায় ভীষণভাবে আহত হন। পরে দিল্লীর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

স্মরণীয় বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য তিনি মরণোত্তর মহাবীর চক্র লাভ করেছেন।